

Vol. 24 | No. 2 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য

Volume	24
Issue	2
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	June 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v24i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v24i2.1
Pages	1-4
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য

আহমদ শরীফ

এ সত্য আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আজকের বাঙালীর অধিকাংশই এক সময়ে ছিল বৌদ্ধ। এবং প্রায় সব বাঙালীই আর্যরক্ত বঞ্চিত। গুপ্ত-শশাঙ্ক-সেনরা বাঙলাদেশের অংশ বিশেষ বা অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করলেও এখানে যে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পায়নি, তার আভাস রয়েছে আদিশূর কিংবদন্তীতে, সাক্ষ্য আছে বল্লালসেনী কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন প্রয়াসে এবং প্রমাণ আছে সামগ্রিকভাবে যজ্ঞ হোম প্রভৃতির অনুল্লেখে বা বিরল উল্লেখে আর লৌকিক দেবতা পূজক পঞ্চোপাসক বর্তমান হিন্দুসমাজের অস্তিত্বে।

পূর্বেই নানা প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করেছি যে, অস্ট্রিক-মঙ্গোল অধ্যুষিত এ দেশের মানুষের মন-মনন এক বিশিষ্ট ধারায় পুষ্ট ও বিবর্তিত হয়েছে। বহু বহু কাল তাদের চেতনা কেবল এই মর্ত্যজীবনের রহস্যজিজ্ঞাসু ছিল। তাই তাদের জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা তথা তাদের জন্ম-জীবন-মৃত্যু জিজ্ঞাসা তাদেরকে দেহ-সন্ধিৎসায় প্রবর্তনা দিয়েছে। এরই প্রসূন সাংখ্যতত্ত্ব যোগচর্যা এবং মন্ত্র ও তন্ত্র শক্তির আবিষ্কার। বহিরাগত বর্তমান শাস্ত্র, সংস্কৃতি ও সমাজনীতি বাহ্যত বারবার গ্রহণ-বরণ করলেও বাঙালী কখনো তার স্বধর্ম ছাড়েনি। সাংখ্য-যোগ-মন্ত্র-তন্ত্র বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী মতকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-ইসলামী মতের স্থানিক ও কালিক বিকৃতির মধ্যেই সেই সনাতন সংস্কারের স্থিতি। উৎসব, মতবাদ ও শাস্ত্রের চাপে পড়ে কখনো বা ঋজুভাবে, কখনো বা বক্রভাবে স্বরূপে বা ছদ্মরূপে প্রাচীন বাঙালীর স্বকীয় বিশ্বাস-সংস্কারই দেহজ চর্মরোগের মতো আজো স্বতো ও স্বপ্রকাশ রয়েছে। পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-নারী পূজা, মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ এবং ধ্যান-কর্মবাদ-জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি যে দেশজ,—আর্য অবদান নয়—তা আজকাল আর অস্বীকৃত হয় না।

জীব-শ্রেণী হিসেবে বিশ্বমানবের চিন্তা-চেতনায় সাদৃশ্য রয়েছে। এ সবকে স্বভাবজ বা স্বতঃস্ফূর্ত বলে মানতে হয়। যেমন বুনো-বর্বর-ভব্য পৃথিবীর তাবৎ মানুষ মনে করে যে এক সময়ে কিছুই ছিল না, ক্রমে সব সৃষ্টি হয়েছে, তারা এ-ও বলে যে আদিতে পৃথিবী ধূম্রময়, জলময় এবং অন্ধকারময় ছিল। সবাই অদৃশ্য অরিশক্তি এবং মিত্র-শক্তিও মানে। সবাই অবচেতন মনে হয়তো বুঝেছিল যে সূর্যই প্রাণের উৎস। সূর্য রশ্মি ব্যতীত কিছুই জন্মায় না, বাড়ে না, বাঁচে না। তাই সূর্য হয়েছে সবারই পূজ্য। সূর্যের মর্ত্যপ্রতিরূপ অগ্নিও তাই হয়েছে উপাস্য। তা ছাড়া শক্তির, কল্যাণের, সৌন্দর্যের, পূর্ণতার ও পবিত্রতার প্রতীক হয়ে রয়েছে সেই আদিম আলো, জ্যোতি, প্রভা বা বিভা যা সূর্যসম্ভব ও সূর্য-নিঃসৃত। কাজেই এসব আদি ও মৌলিক ধারণার ক্ষেত্রে কেউ কারো কাছে ঋণী নয়। সাদৃশ্য মাত্রই লেন-দেন নয়।

সবিতা যে জগৎ কারণ, তার মর্ত্যরূপ যে অগ্নি, তা' জোরাস্ট্রীয় ও বৈদিক ঐতিহ্যে যেমন মেলে, সেমেটিক ঐতিহ্যেও তেমনি মেলে। মুসা তুর পর্বতে জ্যোতির্ময়-অগ্নিময়

যেহোবাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যাঁর তেজে তুর পর্বত জ্বলে গেল। সূর্য যে সৃষ্টির ও বৃষ্টির উৎস, সে ধারণাও দেশী ঐতিহ্যে মেলে। আজো অস্বাভাবিক গ্রীষ্মকে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস বলে মনে করা হয়। সূর্য-প্রতীক শিব আজো বৃষ্টির, ফসলের ও প্রজা-সৃষ্টির দেবতা। তাই শিব থেকেই স্বামী-বর প্রার্থনা করতে হয়, শিব-লিঙ্গে পানি ঢালতে হয়, জলে নেমে সূর্যস্তব করতে হয়।

মানুষের আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কার প্রতিকূল প্রতিবেশে গুল্ম-ঔষধির মতো সাময়িকভাবে আত্মগোপন করে বটে, কিন্তু তার জড় থেকে যায় এবং দুর্বল মুহূর্তে তা জেগে উঠে। বিশ্বাস-সংস্কার কালান্তরে রূপান্তর লাভ করে, কিন্তু একেবারে লোপ পায়না। তাই সর্বপ্রাণবাদ, যাদু বিশ্বাস ও টোটেম-টেবু স্তরের অনেক কিছুই আমাদের চেতনা-প্রবাহে সুগোপনে থেকে যায়। তা ছাড়া স্থান ও কালের চাহিদানুযায়ী বাহ্যত অনেক কিছুই গ্রহণ করতে হয়। বদলায় বটে, কিন্তু সংস্কার মন-মেরুদণ্ডের মতো কাজ করে। বিশ্বাস ও সংস্কারকে বীজরূপে কল্পনা করলে পল্লবিত মহীরুহরূপ সভ্য-সংস্কৃত মানুষের বিকাশ-বিস্তার অন্য অনেক কারণ-ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল হলেও কিন্তু ঐ বীজের ঋণ কিছুতেই ঘোচে না।

আমরা দেখেছি বাঙলাদেশের যারা অস্ট্রিক-দ্রাবিড় অধিবাসী তারা বিজিত মানুষ। তারা যখন বুনো-বর্বর স্তরে, তখনই তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সভ্য-মানুষের সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনা প্রসূত শাস্ত্র ও তত্ত্বদর্শন এবং তার সঙ্গে এলো বিদেশীদের সাম্রাজিক শাসন-শোষণ। এর জন্যে তাদের মানস কিংবা ব্যবহারিক প্রস্তুতি ছিল না। এমন মানুষ সযত্নে আচার-আচরণ অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু বোধের জগতে আত্মবিশ্বাস ঘটাতে পারেনা। তাই সাধারণ মানুষ শাস্ত্র মানে কিন্তু তত্ত্ব বোঝেনা। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মশাস্ত্র কেবলই আচারিক। বিদেশী শাসনকালে তাদের অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের জীবন-জীবিকায়, জগৎ-চেতনায় ও জীবন-ভাবনায় আত্মোন্নয়ন ঘটেনি। সেই মানুষ আজো রিক্ত-নিরক্ষর বৃত্তিজীবী হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-চাঁড়াল-বাগ্‌দী-কৈবর্ত-কামার-কুমার-তাঁতী-তেলী-নিকারী-নাপিত-ধোপা-চাষীরূপে সংখ্যায় গুরু। দু হাজার বছর আগে তাদের জীবন-জীবিকা যে অমানবিক স্তরে ছিল, তা প্রমাণে অনুমানে জানা-বোঝা যায়। তেমন মানুষ সর্বপ্রাণবাদে, যাদু বিশ্বাসে, টোটেম-টেবু নীতিতে আস্থা রাখত। এই সবই ছিল তাদের অলিখিত ধর্ম, শাস্ত্র, তত্ত্ব ও দর্শন। তাদের ব্যবহারিক ও মানস জীবন নিয়ন্ত্রণ করত কালোচিত বিশ্বাস-সংস্কার, সে মানুষ সৃষ্টি-সম্ভব পুরুষ-প্রকৃতিতে বিশ্বাস রাখত। সাংখ্য তাদেরই মানস প্রসূন। মর্ত্যজীবনের বিরুদ্ধ পরিবেশে দেহ-চেতনাও তাদের আদিম, চাওয়া-পাওয়ার মধ্যখানের বাধা তাদের অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তি সম্বন্ধেও সচেতন রেখেছিল। কাজেই দৈব প্রতীক অনেক শক্তির প্রতি তাদের ছিল সহজাত ভয়-ভরসা। আগেই বলেছি জন্ম-জীবনের উৎস সূর্যকে কেউ কোথাও অস্বীকার করেনি, সূর্য প্রাণপুরুষ বলেই শিব। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাধারণ ধারণা থেকে 'উমা'ও পরিকল্পিত। শাকম্ভরীর ধারণা তাই সুপ্রাচীন। এই মানুষই যখন জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী শাস্ত্র গুরুমুখ থেকে গ্রহণ করল, তখন কিছু না বুঝেও শাস্ত্রীর নির্দেশে শাস্ত্রাচার ব্যবহারিক জীবনে মানতে চাইল। মন বাঁধা রইল অতীত বিশ্বাসে-সংস্কারে, ভয়ে ও ভরসায়, আর প্রাত্যহিক জীবন সমার্পণ করল অজ্ঞাত অবোধ্য শাস্ত্রে। ফলে জীবনে-মননে অতীত-বর্তমানের, বিশ্বাসের ও আচারের অসঙ্গত মিশ্রণ ঘটল। এমনি মিশ্রণ দুনিয়ার সভ্য সমাজে সর্বত্র আজো দৃশ্যমান। কারণ মানুষ না পারে পুরোনো সংস্কার ছাড়তে, আবার না পারে নতুন মত-পথকেও এড়াতে। তাই আমরা ধর্ম-পূজারীদের কেবল বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে নয়, ইসলামপন্থীদের সাথেও সহা-বস্থানের গরজে আপোস করতে দেখি (বড় জালালী: শেকশুভোদয়া ও ছোট জালালী

তথা নিরঞ্জনের রুষ্মা দ্রষ্টব্য)। এ সূত্রে মনসামঙ্গলের হাসান-হোসেন পালা ও পীর পাঁচালী স্মর্তব্য। উড়িষ্যা ও রাঢ় অঞ্চলের এক বিস্তৃত বুনো অঞ্চলে (মহাবীর ও জৈন শ্রাবকদের রাঢ়-পর্যটনের অভিজ্ঞতা স্মর্তব্য) জৈন বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারিত হয় খ্রীস্টপূর্ব কালে। এরা—বোঝা যাচ্ছে, সূর্য উপাসকও ছিল। কি নামে তারা সূর্য দেবতাকে ডাকত, তা আমরা জানিনে। জৈন-বিলুপ্তিতে সবাই যখন বৌদ্ধ, তখন এসব বুনো-বর্বর, মনে রিক্ত ও ধনে নিঃস্ব দৈবনির্ভর বৃত্তিজীবী মানুষের নৈরাত্ম্য নিরীশ্বর নির্বাণবাদী বৌদ্ধ শাস্ত্র, তত্ত্ব ও দর্শন বুঝবার সাধ্য ছিল না। তারা শুনেছে এক রাজপুত্র এ শাস্ত্রের প্রবর্তক। পূর্বসংস্কার বসে তারা সহজেই জেনেছে-বুঝেছে যে জীবন দৈবনিয়ন্ত্রিত। সে-দৈব শক্তি মানতে হবে। কাজেই সে-দৈব শক্তির নতুন নাম ধর্ম। গৌতম বুদ্ধ শাস্ত্র প্রবর্তক, সঙ্ঘ বা শ্রাবক ভিক্ষুরা হচ্ছেন শাস্ত্রী। কাজেই ঐ বুনো-বর্বর মানুষ বুঝল 'ধর্ম'ই তাদের পূর্বসংস্কারের সর্ব নিয়ন্তা দেবতা। এবং পূর্বসংস্কার বশে এ ধর্মকে তারা সূর্যেরই[১] প্রতিরূপ মনে করল। শুধু এদের ক্ষেত্রে নয় সাধারণ মানুষ মাত্রই পৌত্তলিক—অবয়বে-আচারে দৃষ্টিগ্রাহ্য না হলে 'ভাব' রূপে কিছুই ধারণা করা সম্ভব হয়না। যারা 'নিরাকার' স্রষ্টা মানে তারাও অনাদি জ্যোতি স্বরূপ কিছু কল্পনা করে। আর শক্তিকে অনুভব-সাধ্য করার জন্যে তাঁরও হাত-পা-নাক-কান-চোখের রূপক ব্যবহার করে জানার দেখার ও করার শক্তির ধারণা পাবার জন্যেই। বস্তুত পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কিছুই মানুষ কল্পনা করতে পারেনা, তাই ইন্দ্রিয়গত ধারণা প্রয়োগে সে হাত-পা-মাথা-চোখ-পাখায় হ্রাস-বৃদ্ধি করে দৃষ্টিগ্রাহ্য দেব-দৈত্য-রাক্ষস-জিন-পরী-গন্ধর্ব সৃষ্টি করেছে। ভাষায় প্রতীকী অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে এই প্রয়োজনেই।

যা হোক, বাহ্যত বৌদ্ধাচার যখন গ্রহণ করল, তখন তারা শাস্ত্রী-শ্রাবকের নির্দেশে কিছু বৌদ্ধ পরিভাষাও বুঝে-নাবুঝে 'বুলি' হিসেবে উচ্চারণ করতেই হয়েছে। সেভাবেই **নির্বাণ, শূন্য, বুদ্ধ, তথাগত,** প্রভৃতি পরিভাষা ও তত্ত্ব এসেছে। না বুঝে শূন্যকে (কেননা তারা পাথর-প্রতীক মানে) ধ্যান করতে হয়েছে: যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরানা নাস্তিকায়ো ন নাদঃ। নাকারো নৈবরূপং ন চ ভয়সরণে নাস্তি জন্মাদি জস্য।। যোগী-দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকল জনময়ং সর্বলোকৈকনাথম্। ভক্তশাম কামপুরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ **শূন্য মূর্তিম্**।।

আবার বৌদ্ধ-বিলুপ্তির পরে এরা যখন ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রান্তে ছদ্মনামে আশ্রিত হল, তখন ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-উমা প্রভৃতি দেবতার নাম ও তৎসম্বন্ধীয় পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ্য আবরণ দেয়ার চেষ্টা করেছে। তুর্কী বিজয়ের পরে আবার কিছু তুর্কী প্রভাবও স্বীকার করে কালোপযোগী রূপ দান করা হয়েছে। সবটাই মনে হয় অনুকরণের অবচেতন প্রেরণা প্রসূত। দেশজ মানুষের প্রভাবে বৈদিক ধর্মের, শাস্ত্রের ও তত্ত্বের পৌরাণিক সমন্বয়, রূপান্তর ও বিকাশ এ সূত্রে স্মর্তব্য। কেবল ধর্মপন্থীদের ক্ষেত্রে নয়, দুনিয়ার তাবৎ শাস্ত্রপন্থীদের মধ্যে এরূপ দেশজ, লোকজ ও অপর শাস্ত্র প্রভাবজ আচার-সংস্কার ও রীতি-নীতির মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছে। তবু কোন বিশেষ রীতি বা তত্ত্বের সাদৃশ্য সব ক্ষেত্রে প্রভাব জ্ঞাপক নয়—আকস্মিক মিলও বটে।

অতএব আমাদের ধারণায় প্রাচীন সূর্যদেবতা রাঢ়ের অন্ত্যবাসী বৌদ্ধ সমাজে বৌদ্ধ ত্রিশরণ বা ত্রিরত্নের অন্যতম 'ধর্ম'রূপে কিন্তু নবতত্ত্বাশ্রিত হয়ে টিকে ছিলেন। রাজপুত্র প্রবর্তিত ধর্ম—এ সংস্কার বশে দেবতা হিসেবে কল্পিত 'ধর্ম, 'রাজা' রূপেও আখ্যাত। অথবা শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে তিনি 'ধর্মরাজা' (ধর্ম রায়), আর দেবতা ও রাজা মাত্রই ঠাকুর। কাজেই তিনি ধর্মঠাকুরও। আবার অমরকোষে বুদ্ধকেই ধর্মরাজ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে: "সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ।" উল্লেখ্য যে বহু আরণ্য গোত্র—

খরিয়া, ভূইয়া, বোণ্ডো, গদরা, জুয়াঙ, কন্দ, মাল পাহাড়িয়া, ওঁরাও ঈশ্বর বা স্রষ্টাকে 'ধর্ম' বলে। বৌদ্ধরা নিজেদের সদ্ধর্মী (সৎ+ধর্মী) বলে পরিচয় দিত। কাজেই ধর্মঠাকুরের পূজারীরা সদ্ধর্মী। ধর্ম সাধারণভাবে বৌদ্ধ ত্রিশরণের অন্যতম হিসেবে বৌদ্ধ ভারতে তথা বৌদ্ধ জগতে অজ্ঞাত ছিলনা। তাই আল্লাহ অর্থে 'ধর্ম' মুসলিম কবিও প্রয়োগ করেছেন।[২] যে দেবতা বন্ধ্যা নারীকে সন্তানবতী করেন, দুরন্ত কুষ্ঠরোগে নিরাময় দান করেন, ভক্তের চক্ষুরোগ দূর করেন, ভক্তের জীবনে জয় ও নিরাপত্তা দান করেন, তাকে ছাপোষা দুর্বল লিপ্সু বিষয়ী মানুষ অবহেলা করতে পারেনা, তাই ডোম-চাঁড়াল-বাগ্‌দীর দেবতা 'ধর্মঠাকুর' প্রথমে গোপনে পরে প্রকাশ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও পূজ্য হয়ে উঠলেন। লক্ষণীয় যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য পাঁচালীর রচয়িতারা প্রায় সবাই ব্রাহ্মণ। তাঁদের হাতে পড়েই বৌদ্ধ ধর্ম-ঠাকুর পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবতার (নারায়ণ) রূপ লাভ করেছেন। রামাই পণ্ডিত কিংবা ময়ূর ভট্টের হাতে তাঁর বৌদ্ধরূপ প্রায় অবিকৃত ছিল—যদিও তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসে গেছেন। ব্রাহ্মণ পাঁচালীকারেরাও তাঁর বৌদ্ধরূপ পুরো অপসারিত করতে পারেন নি। তাঁদের অসাবধানতায় হয়তো বৌদ্ধ-রূপ স্থানে স্থানে প্রকট। এমন কি বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গল রচনা করতে গিয়েও ধবলাকার ধর্ম-নিরঞ্জনকে স্মরণ করেছেন।

অন্য প্রসঙ্গে[৩] আমরা বাঙলার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের কথা বলেছি, ধর্মপন্থী, নাথপন্থী, গোরক্ষ-পন্থী, সহজপন্থী, সহজিয়াবৈষ্ণব, বাউল (কিশোরী, কর্তাভজা, সাঁইপন্থী প্রভৃতি সব শ্রেণীর বাউল) ও যোগী-তাঁতীরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাছাড়া বিভিন্ন পন্থী যোগ-তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা এবং বাঙলার সূফীরা গভীরভাবে বৌদ্ধ যোগ, বৌদ্ধ দেহতত্ত্ব ও বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্ব প্রভাবিত।[৪] বাঙলার বর্তমান হিন্দু সমাজে পূজ্য অধিকাংশ লৌকিক দেবতাই বৌদ্ধ যুগের (আদি নাথ, চন্দ্রনাথ, তারা, বৎসলা জাঙ্গুলী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি) আর আজকের হিন্দু-মুসলমানের ঘরোয়া আচারে সংস্কারেও রয়ে গেছে বৌদ্ধ সমাজের নানা রীতি-রেওয়াজ। অতএব নাথ সাহিত্য, ধর্ম সাহিত্য, সহজিয়া সাহিত্য, যোগতান্ত্রিক সাহিত্য একান্তই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য।

নির্দেশিকা

১. ডক্টর সুকুমার সেনের মতে কোলিদের কূর্মবাচক দরম বা দড়ম থেকে ধর্ম শব্দ উদ্ভূত রূপরামের ধর্ম মঙ্গল ভূমিকা (২য় সং)

২. শাহ মুহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য দ্রষ্টব্য

৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য : চর্যাগীতি পাঠের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৪. বাঙলার সূফী সাহিত্য পৃ. ব-ন, ৭-১৩